গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ২২ - ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য, প্রবীণ জননেতা

কমরেড সি কে লুকোসের জীবনাবসান

কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরোর বিশিষ্ট সদস্য কমরেড সি কে লুকোসের প্রয়াণে গভীর শোকজ্ঞাপন করে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৩ ফেব্রুয়ারি এক শোকবার্তায় বলেন,

দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সি কে লুকোস ১৩ ফেব্রুয়ারি সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিরুবনন্তপুরমের হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু শুধু বেদনাদায়কই নয়, আমাদের কাছে এক গুরুতর আঘাত। এই বিপ্লবী নেতার প্রয়াণে কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করছে।

১৯৬০-এর দশকে বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে কমরেড সি কে লুকোস কেরালায় দল গড়ে তোলার কাজে

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিমা নির্ভর করে তুলে নাগরিকের স্বাস্থ্যের অধিকার কাড়তে চায় সরকার

'ডিজিটাল ভারতে' অবশেষে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির চিকিৎসা পরিষেবাও 'ডিজিটালাইজড' হল। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, এবছর থেকেই দেশের কমপক্ষে ১০ কোটি পরিবারকে অর্থাৎ কমবেশি ৫০ কোটি মানুষকে এই স্কিমের মাধ্যমে বিনা পয়সায় সমস্ত সাধারণ চিকিৎসা এবং বাছাই করা কিছু জটিল রোগের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে। স্বভাবতই সাধারণ মানুষ, যাঁরা দেশের বর্তমান স্বাস্থ্য পরিকাঠামো থেকে সামান্য কিছু চিকিৎসার সুযোগ পান, অথবা কখনও কখনও একেবারেই বঞ্চিত হন, তাঁদের কেউ কেউ আশান্বিত। কিন্তু ইতিপূর্বে এই ধরনেরই অনেকগুলি স্কিমের আওতায় যাঁরা এসেছেন, সেই ভুক্তভোগীরা আশ্বস্ত হতে পারছেন না। তাই বিগত দিনের সরকারি ও বেসরকারি হেলথ স্কিমগুলি, যথা 'আয়ুষ্মান ভারত', 'ন্যাশনাল হেলথ প্রোটেকশন মিশন' ইত্যাদির চুলচেরা বিচার হওয়া দরকার। শাসকরা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ঢাক যতই পেটাক না কেন স্বাধীনতার ৭২ বছর পরেও স্বাস্থ্যকে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দেয়নি। অবশ্য সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা রাষ্ট্রের একটি অন্যতম দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। সেই দায়িত্বটুকুও রাষ্ট্র কীভাবে পালন করে, তার বিচার হওয়া দরকার। কারণ স্বাস্থ্য এমন একটি বিষয় যার সাথে মানুষের জীবনমরণ নির্ভর করে রয়েছে।

প্রথমেই দেখা দরকার, কীভাবে বিভিন্ন জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতির মাধ্যমে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পণ্যে পরিণত করেছে। কংগ্রেস সরকারের প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ১৯৮৩-র মধ্যেই লুকিয়ে ছিল স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরণের বীজটি। ২০০২ সালের দ্বিতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে স্বাস্থ্য-বাণিজ্যের সিংহদুয়ার খুলে দেয় বিজেপি পরিচালিত তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার। এরপর কংগ্রেসের হাত ধরে ২০০৫-এর গ্রামীণ জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ২০০৯ সালে জাতীয় স্বাস্থ্য বিল সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই ধাপে ধাপে বাণিজ্যিকীকরণের পথকে প্রশস্ত করা হয়। ২০১৭ সালে আবার বিজেপি সরকার তৃতীয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার নতুন মডেল তৈরি করেছে। বলা হয়েছে, সমস্ত ভারতবাসীর চিকিৎসা হবে বিনা পয়সায়, কিন্তু বিমা কার্ডের মাধ্যমে। বর্তমানে মোদি সরকার যাকে 'আয়ুষ্মান ভারত হেলথ প্রোটেকশন মিশন' হিসাবে ঘোষণা করেছে। এ ক্ষেত্রে আয়ুষ্মান কার্ডের বিনিময়ে প্রতিটি পরিবার বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা ফ্রি পাবে। এ পর্যন্ত যতগুলি সরকারি বিমা স্কিম চালু ছিল, যেমন আরএসবিওয়াই, সিনিয়র সিটিজেন হেলথ ইনসিওরেন্স স্কিম ইত্যাদি স্কিমগুলি ক্রমশ আয়ুষ্মান ভারতের সাথে একীভূত হয়ে যাবে। অর্থাৎ অন্যান্য স্কিমের সুযোগ এর পর থেকে আর পাওয়া যাবে না।

বিমা নির্ভর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মানে আসলে বিনামূল্যে সরকারি চিকিৎসার অবসান। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য কর্পোরেট হাসপাতাল। যেখানে চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য মধ্যবিত্ত জনগণের নেই। ফলে রোগী নামক খরিদ্দার জোগাড় করতে কর্পোরেট মালিকেরা সরকারের সাহায্য চায়। সরকারও সুকৌশলে চালু করে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যবিমা। বর্তমানে যার পোশাকী নাম আয়ুষ্মান ভারত। এর আওতাভুক্ত চিকিৎসার খরচ মেটাবে সরকার। রোগী বেসরকারি হাসপাতালেও ভর্তি হতে পারবেন। সেখানে চিকিৎসার খরচ মেটাবে সরকার। অন্তত ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত। স্বভাবতই ঝাঁ চকচকে কর্পোরেট হাসপাতালে রোগীর ভিড় বাড়বে। সরকারি বদান্যতায় জনগণের টাকায় ফুলে ফেঁপে উঠবে তাদের স্বাস্থ্যব্যবসা। মানুষের দৃষ্টি এ ভাবে কর্পোরেটমুখী করে দিয়ে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার বড় বড় অংশগুলি কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে— যার কাজ অনেকাংশে ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে। বিমা কোম্পানিগুলির মুনাফাও এর মধ্যে বেড়ে সহস্র গুণ হবে তা বলাই বাহুল্য।

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যবিমার পরিণতি কী হচ্ছে তা দেখা যাক। আমাদের দেশে কমবেশি ১০ শতাংশ মানুষ বেসরকারি বিমার আওতায় রয়েছেন। আরএসবিওয়াই (রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা) ও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যসাথীর মতো সরকারি বিমা প্রকল্পের আওতায় নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারগুলি অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে বেসরকারি বিমার হয়রানি নিয়ে কমবেশি অনেকেরই অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেখানে প্রায়শই দেখা যায় কোনও ব্যক্তি যে রোগে ভুগছেন, সেই রোগটিই বিমার আওতায় নেই। থাকলেও তার টাকা ফেরত পেতে জুতোর শুকতলা পর্যন্ত খোয়াতে হয়। আর শুকতলা খোয়ানোর পরও এক তৃতীয়াংশ মানুষ বিমার টাকা ফেরত পান না। আরএসবিওয়াই-র ক্ষেত্রে একবার কেউ ছোটোখাটো অসুখ নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলে— ১/২ দিনের মধ্যেই ১ লক্ষ টাকার উপরে বিল হয়। এর পরে আর ওই পরিবারের পক্ষে ১ লক্ষ টাকার উপরে বাড়তি টাকা দিয়ে চিকিৎসা করানোর সাধ্য থাকে না। শুরু হয় সরকারি হাসপাতালে দৌড়ঝাঁপ— সেখানে বেড না পেয়ে বহু মানুষকে আজ বিনা চিকিৎসাতেই মরতে দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে আরএসবিওয়াই-এর সুবিধা ক'টি মানুষ পেয়েছেন তা হাতে গুণে বলা যাবে। আজ অধিকাংশ নার্সিংহোমেই এর সুযোগ আর পাওয়া যাচ্ছে না। এ যেন বিমার জাদু-সম্মোহনে বিনা পয়সায় স্বাস্থ্যের অধিকারকেই ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা!

তা হলে, বিজেপির আয়ুষ্মান ভারতকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে না দেওয়াটা কি তৃণমূল সরকারের কোনও বিপ্লাবত্মক পদক্ষেপ? নাকি কেন্দ্রীয় সরকার যে সব কর্পোরেট হাসপাতালকে ওই বিমার আওতাভুক্ত করেছে সেই তালিকায় তৃণমূল কর্তাদের পছন্দের বহু কর্পোরেট হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের নাম বাদ গেছে বলেই এই হুঙ্কার? মুখ্যমন্ত্রী ফলাও করে বলছেন, ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যসাথীর মতো জনমুখী স্বাস্থ্য বিমা তিনি পশ্চিমবঙ্গে চালু করেছেন, যার মাধ্যমে রাজ্যের প্রান্তিক মানুষজন থেকে নিম্নবিত্ত সকলেই ক্যাশলেস চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। বহু পরিবার ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হাতে পেয়েছেন। যদিও ফ্রি চিকিৎসা কতটা তারা পাচ্ছেন তা প্রশ্নচিহ্নের মুখেই রয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রের এই প্রকল্পের বিরোধিতা কি আদৌ স্বাস্থ্যকে বিমানির্ভর হতে না দেওয়ার জন্য?

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১৭-তে বিমা নির্ভর স্বাস্থ্য পরিষেবা চালুর কথা বলার পরে সর্বপ্রথম তা কার্যকরী করলেন আমাদেরই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী— নাম দিলেন 'স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প'। এতে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি পরিবার ফ্রি চিকিৎসা পাবে এবং চিকিৎসা হবে কর্পোরেট হাসপাতাল ও কিছু নির্বাচিত নার্সিংহোমে। চিকিৎসার টাকা মেটাবে সরকার। দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য বাজেটে মৌলিক বিষয়গুলির জন্য যে টাকা আগে বরাদ্দ হত, তা থেকে কেটে নিয়ে মোটা অংশের বরাদ্দ গেছে স্বাস্থ্য বিমার বিল মেটাতে। এর ফলে মানুষ কী সুযোগ পাচ্ছে? আজ যে নার্সিংহোমে চিকিৎসার সুযোগ মিলছে — নিয়মের বেড়াজালে কাল আর সেখানে চিকিৎসা মিলছে না। ফলে সেই একই বিমা, একই তার পরিণতি! কোথাও তার নাম আয়ুষ্মান ভারত, কোথাও স্বাস্থ্যসাথী। ঠিক যেমন ৯০-এর দশকে এ রাজ্যের বড় হাসপাতালগুলিতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ নীতি চালু করেছিল তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার, পরবর্তীতে যা জাতীয় নীতি হিসাবে স্বীকৃতি পায় ২০০৫ সালে। সুতরাং মুখে যে যত জনমোহিনী কথাই বলুক না কেন, সমস্ত জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গই পথপ্রদর্শক, সে সরকারে সিপিএম বা তৃণমূল যেই থাকুক না কেন।

স্বাস্থ্যসাথীর মাধ্যমে বেসরকারি হাসপাতালে রোগী পাঠানো আবার সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসা— এ কেমন দ্বিচারিতা! গত এক দশকে এ রাজ্যে তথা গোটা ভারতে রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। সরকারি বেসরকারি উভয় জায়গাতেই তা বেড়েছে। মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, অতিরিক্ত কাজের চাপ, মানসিক ও শারীরিক চাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ক্যানসার, ফুসফুসের নানা রোগ, হার্টের রোগ, নার্ভের রোগ, মানসিক রোগ ইত্যাদি বেড়েছে বহু গুণ। কিন্তু সরকারি পরিষেবার গুণমান কী দাঁড়িয়েছে? সেখানে ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীর পদ গত ৩০ বছরে বাড়েনি। নির্ধারিত যে পদ রয়েছে তারও একটা বড় অংশ বরাবরই ফাঁকা থাকে। যেমন বর্তমানে গ্রামীণ স্তরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নব্বই শতাংশ পদই ফাঁকা পড়ে রয়েছে। বেডের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে বাড়ানো হয়নি। যেখানে সারা বিশ্বে ১০০০ মানুষ পিছু ৩.৩টি বেড রয়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে মাত্র ১.৩টি বেড। ফলে বেডের সাংঘাতিক সংকটের ফলে এক একটি বেডে কোথাও ৩-৪ জন করে রোগী ভর্তি থাকতে বাধ্য হন। এর ফলে চিকিৎসার মান যেমন কমছে তেমনই ভর্তি থাকা রোগীদের ক্রশ ইনফেকশনে ভুগে প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছে। আর একদিকে ভর্তির সময় বেড সংকটের সুযোগ নিচ্ছে দালাল চক্র। ভর্তি করানো, পরীক্ষা-নিরীক্ষার তারিখ পাইয়ে দেওয়া, অপারেশনের ডেট এগিয়ে আনার জন্য মানুষ দালাল চক্রের পাল্লায় পড়ে হয়রান হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, এ রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলেও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ব্লকস্তরে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা গ্রামীণ হাসপাতালের সংখ্যা বাড়েনি। বর্তমানে জনসংখ্যার নিরীখে যেখানে কমপক্ষে ২৩৩৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৭০০টি ব্লকস্তরের হাসপাতাল দরকার সেখানে রয়েছে মাত্র ৯০৪টি এবং ৩৪৭টি। এই স্তরের পরিষেবা বাড়ানোর পরিকল্পনা এবং ঘোষণা বিগত সরকার এবং বর্তমান সরকার কারোরই নেই, যা ছিল স্বাস্থ্যের ভিত। উল্টে এই বিষয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের সবরকম সুপারিশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ভোটের জনমোহিনী প্রচারের স্বার্থে রাজ্য সরকার জনগণের কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাজ্য জুড়ে অপরিকল্পিতভাবে ৪১টি মাল্টি সুপার হাসপাতাল গড়ে তুলেছে। উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য চিকিৎসক ও লোকবলের অভাবে সেগুলি আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলে যথারীতি আগেকার মতোই আজও গ্রামবাংলা থেকে হাজারে হাজারে রোগী কলকাতার মেডিকেল কলেজগুলিতে রেফার হয়ে যাচ্ছে। আর সেখানে গিয়ে বেড ও পরিকাঠামোর অভাবে কেবলমাত্র জরুরি বিভাগ থেকেই দৈনিক ৪৭৬ জন রোগী ভর্তি হতে না পেরে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। তাদের কেউ কেউ ঘটিবাটি বিক্রি করেও কর্পোরেট হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ নিচ্ছেন। বাকিরা বিনা চিকিৎসায় মারা যচ্ছেন। পাশাপাশি ওই সব ঝাঁ চকচকে সরকারি মাল্টিসুপার হাসপাতালগুলিকে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ব্যবসা করার জন্য কর্পোরেট মালিকর হাতে তুলে দিচ্ছে। যেমন শালবনী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালটি কিছুদিন আগে জিন্দাল গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত, সরকারি হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা অনুপাতে বেড না বাড়লেও বেসরকারি ক্ষেত্রে বেড বেড়েছে অনেক। গত ৭-৮ বছরে সরকারি বেড বেড়েছে মাত্র ১৫ শতাংশ, কিন্তু বেসরকারি বেড বেড়েছে ২৭ শতাংশ। অর্থাৎ বর্তমান স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে জনস্বার্থবিরোধী সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির জন্য স্বাস্থ্য নিয়ে কর্পোরেট ব্যবসা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। যা বিগত তিন দশকের ধারাবাহিকতাকেও আজ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পূর্বতন সরকার বিভিন্ন জনস্বার্থ বিরোধী স্বাস্থ্যনীতি প্রয়োগ করে কলকাতার বাইপাস জুড়ে কর্পোরেট হাসপাতাল তৈরিতে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিল। আর বর্তমান সরকার জেলা, এমনকী মফঃস্বল শহরে ও স্বাস্থ্য নিয়ে কর্পোরেট ব্যবসার সুযোগ করে দিচ্ছে। পাশাপাশি সরকারি পরিষেবাগুলিও পিপিপি নীতিতে কর্পোরেট মালিকদের হাতেই তুলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পুঁজিবাদের চরম সংকটের ফলে বেকার ও উপার্জনহীন মানুষের সংখ্যা যখন ক্রমাগত লাফিয়ে বাড়ছে, তখন এই বিপুল সংখ্যক কর্পোরেট হাসপাতালে রোগী নামক খরিদ্দার আসবে কোত্থেকে? সুকৌশলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যের সরকারগুলি বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের মাধ্যমে এই সব কর্পোরেট হাসপাতালে খরিদ্দারের জোগান দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হলে আজ আপামর জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া পথ নেই।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

কাশ্মীরে সিআরপিএফ হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে
কেন্দ্রীয় কমিটি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৬ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

কাশ্মীরে সিআরপিএফ সেনাদের হত্যাকাণ্ডের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। এই ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ভারত সরকার এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্ত্রাসবাদীদের দায়ী করেছে। এ কথা সকলেরই জানা যে, ভারত সরকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই তালিবান, আল কায়েদা, আইসিস, জৈশ মহম্মদ ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে নিজস্ব স্বার্থে মদত দিয়ে গড়ে তুলেছে। আবার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিও নিজেদের স্বার্থে কোনও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে তাকে সন্ত্রাসবাদীদের কাজ বলে অভিহিত করছে।

কাশ্মীরের পুলওয়ামায় এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের তীব্র ধিক্কার জানিয়েও জনমানসে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, ভারত সরকার যখন কাশ্মীরকে বাস্তবে রাষ্ট্রপতি শাসন ও সামরিক শাসনের আওতায় রেখেছে, তখন সেখানে এই ঘটনা ঘটতে পারল কী করে। এই প্রশ্নে কি ভারত সরকার নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে? আরও প্রশ্ন উঠছে যে, দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারা পূর্ণাঙ্গ রূপে কার্যকর না করে কাশ্মীরী জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে উপেক্ষা করে যেভাবে দমন-পীড়ন চালানো হচ্ছে, ভুয়ো সংঘর্ষ দেখিয়ে নিরীহদের হত্যা করা হচ্ছে, পেলেট বন্দুক ব্যবহার করে বহুজনকে অন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, যুবকদের গুমখুন করা হচ্ছে, যার সংবাদ ভারতীয় সংবাদমাধ্যমেই বহুবার প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে, কাশ্মীরের জনগণের মধ্যেও তীব্র ভারত সরকারবিরোধী মানসিকতা গড়ে উঠেছে, যাকেই দেশ-বিদেশের নানা মতলববাজ শক্তি ব্যবহার করছে।

আমরা মনে করি, সামরিক শাসন ও দমন-পীড়ন নয়, একমাত্র শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার দ্বারা কাশ্মীরের জনগণের আস্থা অর্জন করে কাশ্মীর সমস্যার ন্যায়সঙ্গত এবং স্থায়ী সমাধান করার পথ গ্রহণ করতে হবে। পুলওয়ামার হত্যাকাণ্ডকে ভিত্তি করে দেশে উগ্র জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় ইন্ধন দিয়ে তাকে নির্বাচনী স্বার্থে কাজে লাগানোর বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য আমরা জনগণের কাছে আবেদন করছি।

মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

তমলুকের হোগলবেড়িয়া গ্রামে একই এলাকায় তিনটি সরকারি মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৬ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে শতাধিক ছাত্র-যুব-মহিলা বিক্ষোভ দেখান। পরে একটি সুসজ্জিত মিছিল রামতারক হাট এলাকা পরিক্রমা করে। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম মাইতি, অমিয় মাল, বিজয় মল্লিক, পদ্মলোচন গোস্বামী প্রমুখ। দলের লোকাল কমিটির সম্পাদক অশোক মাইতি বলেন, জনসাধারণের দাবিকে উপেক্ষা করে মদের দোকান খুলতে এলে এলাকাবাসী বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে তা রুখব। (ছবি ৩-এর পাতায়)

এমএসএস-এর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন

তিন শতাধিক মহিলার উপস্থিতিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বহরমপুর গ্রান্ট হলে। রাজ্য সভানেত্রী কমরেড হাসি হোড় রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। তিনি ছাড়াও শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী এবং জেলা সভানেত্রী কমরেড পূর্ণিমা কর্মকার। জেলা সভানেত্রী মূল প্রস্তাব পাঠ করেন। সমর্থনে প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করা, নারী নির্যাতন বন্ধ ও প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালুর দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমরেড অনুপা তেওয়ারীকে সভানেত্রী ও কমরেড পর্ণা চক্রবর্তীকে সম্পাদিকা করে ২৫ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

৯-১০ মার্চ কনভেনশন ও রাজ্য সম্মেলনের জন্য দেওয়াল লিখছেন এ আই এম এস এস কর্মীরা

বন্ধ চটকল খোলা, স্থায়ীকরণ, ন্যায্য মজুরির দাবিতে
চটশিল্পে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক

চটশিল্পের সাথে যুক্ত ২১টি ইউনিয়ন আগামী ১ মার্চ থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। কেন এই ধর্মঘট? ২০১৫-র ত্রিপাক্ষিক চুক্তির তিন বছর মেয়াদ শেষ হবার পর ২০১৮ সালের মার্চ মাসে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যে ২২ দফা দাবিসনদ পেশ করেছিল, এক বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও সেই দাবিসনদের কোনও মীমাংসা হয়নি। কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের তৃণমূল কোনও সরকারই দাবিসনদ মীমাংসার ক্ষেত্রে কোনও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি সরকারের এই উদাসীনতা এবং নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে মুনাফালোভী চটকল মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত দাবিগুলি উপেক্ষা করে যাচ্ছে। সম্প্রতি রাজ্যের আটটি চটকলে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' জারি করে মিলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই কারখানাগুলিতে প্রায় এক বছর যাবৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। পরিণতিতে প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক পরিবার অর্ধাহার, অনাহারে সন্তান সন্ততিদের নিয়ে চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। চটকলগুলি খুলে উৎপাদন শুরু করার ব্যাপারে সরকার মালিকদের উপর কোনও চাপই দিচ্ছে না।

বাস্তবে সরকার মালিকদের সেবাদাস হিসাবে কাজ করছে। মালিকদের খুশি করতে ২০০২ সালে সিপিএম সরকার কালাচুক্তি করে শ্রমিকদের মজুরি দৈনিক ১৭২ টাকা থেকে কমিয়ে ১০০ টাকা করে দিয়েছিল। উৎপাদনভিত্তিক মজুরিনীতি চালু করে বাস্তবে বেতন কাটার ব্যবস্থা করেছিল যা শ্রমিক মহলে 'কাটৌতি' নামে পরিচিত। মালিকরা সে সময় শ্রমিকদের চার বছরের বর্ধিত মহার্ঘ ভাতার টাকা লুট করেছে। এ ছাড়া পিএফ, ইএসআই এবং গ্রাচুইটির প্রায় এক হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। শ্রমিক ছাঁটাই এবং গেটবাহার চলেছে। বর্তমানে শ্রমিকদের পার্মানেন্ট না করে আজীবন বদলি এবং কন্ট্রাক্ট হিসাবে রেখে দিচ্ছে মালিকরা। বদলিতে ভর্তি হয়ে বদলি হিসাবেই অবসর নিচ্ছে— এর ফলে সামাজিক সুরক্ষা এবং বহু আইনি সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। চটকলের শ্রমিকদের কোয়ার্টারগুলি কুখ্যাত কুলিলাইন হিসাবে। আলোবাতাসহীন এক চিলতে ঘর, না আছে উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা, না আছে পর্যাপ্ত শৌচাগার। শ্রমিকদের মনুষ্যেতর জীব হিসাবে গণ্য করে মালিকরা। এই আন্দোলনের অন্যতম দাবি হল জীবনধারণ এবং বসবাসের উপযুক্ত কোয়ার্টার শ্রমিকদের থাকার জন্য দিতে হবে। এই অবস্থায় চটশিল্পের শ্রমিকরা বাধ্য হয়েছে ধর্মঘটের পথে যেতে। এবারের প্রস্তাবিত ধর্মঘটের মূল দাবিগুলি হল— আটটি বন্ধ চটকল খোলা, মাসিক ন্যূনতম মজুরি ১৮০০০ টাকা, পেনশন মাসে ৬০০০ টাকা করা, প্রতিটি কারখানায় ৯০ শতাংশ পার্মানেন্ট এবং ২০ শতাংশ স্পেশাল বদলি শ্রমিক রাখা ইত্যাদি।

এই দাবিগুলি সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক দাবি। অথচ এগুলি পূরণ করা নিয়ে সরকার ও মালিক পক্ষের দীর্ঘ টালবাহানা চলছে। এই অবস্থায় প্রয়োজন হল ঐক্যবদ্ধ, আপসহীন, দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম গড়ে তোলা। চটকল শ্রমিকদের লড়াই ও আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। ঐক্যবদ্ধভাবে ৮৪ দিন পর্যন্ত একটানা ধর্মঘটের নজির সৃষ্টি করেছেন তাঁরা। ৮-৯ জানুয়ারির সারা ভারত ধর্মঘটেও চটশিল্পের শ্রমিকরা সর্বাত্মকভাবে অংশ নিয়েছেন। বর্তমান অবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি কারখানায় আন্দোলনের হাতিয়ার 'শ্রমিক কমিটি' বা 'স্ট্রাইক কমিটি' গড়ে তুলতে হবে। এই স্ট্রাইক কমিটিগুলির অনুমোদন ব্যতীত কোনও পরিস্থিতিতেই ধর্মঘট তুলে নেওয়া যাবে না। এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, চটকল শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ অবহেলিত হচ্ছে। ফলে প্রয়োজন হল ঐক্যবদ্ধ, আপসহীন, দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই ধর্মঘট চালিয়ে যেতে হবে। এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এই ধর্মঘট সফল করার জন্য চটকল শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়েছে।

চেন্নাইয়ে যুব বিক্ষোভ

ক্রমবর্ধমান বেকারির প্রতিবাদে ৮ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে বিক্ষোভ দেখায় এ আই ডি ওয়াই ও। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন চেন্নাই জেলা সংগঠনী কমিটির সম্পাদক এস শিবকুমার। সভা থেকে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থান সহ নানা দাবিতে স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com